বিষয় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘ভক্তি’

প্রবন্ধ শিরোনাম

বৈষ্ণব পদাবলীর ‘ভক্তি’র উৎস অনুসন্ধান

সুব্রত ঘোষ , মোবাইল-৯৫৩১৬১৪৩৪৮, ইমেল- amarlekha2014subrata@gmail.com

সারাংশ

১। ‘ভক্তি’ সম্পর্কে হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতা-র দ্বাদশোঽধ্যায় (‘ভক্তিযোগ’) একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেয়। কে প্রকৃত ‘ভক্ত’ আর কী বা প্রকৃত ‘ভক্তি’ আমরা তা জানতে পারি। ২। পরবর্তীকালের ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভের ‘ভাষ্য’ যথাক্রমে ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’, ‘দ্বৈতাদ্বৈতবাদ’, ‘দ্বৈতবাদ’ ও ‘শুদ্ধাদ্বৈতবাদ’ নামে পরিচিত। রামানুজের ভাষ্যেই প্রথম ‘ব্রহ্ম’ আর ‘বিষ্ণু’ একাকার হয়ে যায়। ভাষ্যকার নিম্বার্ক ও বল্লভ ‘ব্রহ্ম’কে ‘কৃষ্ণ’ নামে অভিহিত করেন। মধ্ব ‘ব্রহ্ম’কে ‘বিষ্ণু’ নামে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকের শেষ আশ্রয় ‘ভক্তি’। ভাষ্য অনুযায়ী বৈষ্ণব ধর্মে এই ‘ভক্তি’র তারতম্য আছে। ৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘মধ্যযুগ’ বলতে ১৩৫০খ্রীঃ - ১৭৬০খ্রীঃ, এই চারশ বছর সময়সীমাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘প্রাকচৈতন্যযুগে’(১৩৫০-১৫০০) ও ‘চৈতন্য পরবর্তী কালে’(১৫০০-১৭৬০)-র বাংলা সাহিত্যিক রচনায় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের ভক্তিবাদি আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ৪। শ্রীচৈতন্যর প্রভাবে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে ‘ভক্তি’ নামের ‘ভাবধারা’র বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ‘অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ’ পরিণত রূপ পায়। প্রাকচৈতন্যযুগের ‘বৈধীভক্তি’ চৈতন্য পরবর্তী কালে পরিণত হয় ‘রাগানুগাভক্তি’তে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথা বৈষ্ণব পদাবলীর এই ‘ভক্তি’ তাই কোন ব্যাক্তি বিশেষের আকস্মিক উপলব্ধি নয়। তা হিন্দুধর্মের ‘ভক্তিযোগ’-এর ক্রমিক বিবর্তনের ফসল। বা সংস্কৃত নবভাষ্য মাত্র।

প্রবন্ধ

বৈদিক সাহিত্যের শতাধিক গ্রন্থ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ- মূলত এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। সংহিতায় গান, স্তোত্র মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। সংহিতার 'ঋগ্বেদ' হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থ। বেদ থেকেই 'বৈদিক সাহিত্য' কথাটি এসেছে।[i] বেদ 'ব্রহ্ম'কেই একমাত্র বলে স্বীকার করেছে। এই 'ব্রহ্ম' অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী। 'ব্রহ্ম'কে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। "মণ্ডূকোপনিষদে বলা হয়েছে "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যেদেবৈস্তপসা কর্মণা বা।" অর্থাৎ চোখ কিংবা বাণী ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অথবা তপস্যা, শুভকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে জানা যায় না। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে- 'অদৃষ্টো-দৃষ্টা অশ্রুত শ্রোতা অস্থূলমনণুঃ' অর্থাৎ পরমাত্মা কারো দৃষ্টি গোচর নন, কিন্তু তিনি সবাইকে দেখতে পান, তাঁকে কেউ শুনতে পায় না কিন্তু তিনি সব কিছু শুনতে পান। তিনি স্থূলও নন আবার সূক্ষ্মও নন"। [ii]

"পরা-অনুরক্তির নাম ভক্তি। ইহার জন্য দুজন প্রয়োজন- ভক্তির পাত্র এবং ভক্ত। .... শুধু শূন্যের উপাসনা হয় না; উপাসনা করিতে হইলে উপাস্যকে রূপ দিতে হয়। নির্গুণ ব্রহ্মকে ভক্তি করা যায় না; ভক্তি করিতে হইলে তাঁহাকে দয়াময় কিংবা ঐ ধরণের কোনো বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়।"[iii] শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দ্বাদশোঽধ্যায় ('ভক্তিযোগ')-এ শ্রীভগবান বলছেন, নিরাকার (অব্যক্ত) 'ব্রহ্ম'-র উপাসকদের মুক্তিলাভ কষ্টকর। কারণ 'দেহধারীর নির্গুণ ব্রহ্মলাভ খুবই কষ্টসাধ্য।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।" (৫)[iv]

দেহধারী মানুষ তাই নিরাকার 'ব্রহ্মের তত্ত্ব'কে সাকার রূপ দেয়, প্রচলন হয় মূর্তি পূজার। বেদ পরবর্তী কালের এই ধার্মিক ক্রিয়া ও নানা দেবদেবীর পূজার প্রচলন তাই বেদ বিরোধী। পূজা ও আনুগত্যের পক্ষে ভাষ্যকাররা বেদান্তের একেশ্বরবাদী দর্শনের আলোয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে ঈশ্বরকে। 'ঋগ্বেদ'–এ সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত 'বিষ্ণু' একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছেন। সেখানে তিনি 'সম্বরহন্তা যুদ্ধনেতা, ঋতের গর্ভ এবং পশু রক্ষক'[v] হিসেবে কল্পিত। পশ্চিম ভারতের যাদব ট্রাইবের দেবতা 'কৃষ্ণ'কে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করা হয়।[vi] আসলে ততদিনে সমাজে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পরম শক্তিমান ঈশ্বর আর শাসক রাজা এক হয়ে যান। রাজা

হয়ে ওঠেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা (ভক্তির পাত্র) আনুগত্যই চাইবেন প্রজার (ভক্ত) কাছে। অভিধানে 'ভক্তি' শব্দের অর্থ পাচ্ছি, "পুজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ....; শ্রদ্ধা; সেবা; উপাচার; বিভাগ; ভঙ্গী; রচনা।"[vii] আমরা ত্রয়োদশ-সপ্তদশ শতকের ভারতে দেখব এই 'ভক্তি' আর 'রাজার প্রতি আনুগত্য' সমার্থক থাকবে না। যুগ প্রয়োজনে তা নবরূপ ধারণ করবে।

"পুরোদস্তর একেশ্বরবাদী হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুটি ধর্ম পরিচিত তারা হল বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম।... ভাগবত ধর্মের পরবর্তী পর্যায় বৈষ্ণব ধর্ম রূপে খ্যাত। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকেই এই ধর্মের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত হয়।....এক ঈশ্বরে ভক্তি এক রাজাকে ভক্তিরই নামান্তর, যে কারণে ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর নিজেকে নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ বলেছেন। বৈষ্ণবধর্ম এদেশে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।"[viii] বেদান্তের চরম অদ্বয়বাদী ভাষ্যকে দূরে সরিয়ে আশ্রয় নেওয়া হয় 'ত্রিতত্ত্বের'। "ব্রহ্ম(ঈশ্বর=পরমাত্মা= সম্প্রদায়ের ইস্টদেবতা), চিদ্ (জীবাত্মা=চেতন জীব=মানুষ) এবং অচিদ্ (অচেতন বস্তু=বস্তুজগৎ)। একের মধ্যে এই তিনের বিকাশ, বা তিনের সম্পর্কে এক, চিদাচিদের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, তাঁর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারনত্বের যাথার্থ্য,"[ix] –এই কাঠামোয় 'ঈশ্বর', 'ভক্ত' আর 'ভক্তি'র নির্মাণ।

হিন্দুধর্মে জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ। মোক্ষ অর্থে মুক্তি। সংসারে বার বার জন্ম নিয়ে মায়াবন্ধনে জড়িয়ে কষ্ট পাওয়া থেকে মুক্তি। মোক্ষ লাভের জন্য শ্রীমদ্ভগবদগীতা কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গের সঙ্গে ভক্তিমার্গকেও মর্যাদা দিল। শ্রীমদ্ভগবদগীতা-র দ্বাদশোঽধ্যায়('ভক্তিযোগ')-এ ভগবান বলছেন, "যাঁহারা আমা পরায়ণ হইয়া, সর্বকর্ম আমাতেই সমর্পণ ক্রিয়া স্থির চিত্তে আমাকেই চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, সেই সকল সাধককে আমি মৃত্যুপূর্ণ সংসার-সমুদ্র হইতে অচিরেই রক্ষা করি।"(৬-৭)[x] "যে ব্যাক্তি সর্বভূতে হিংসাশূন্য, মৈত্রীভাব সম্পন্ন, সবাকার প্রতি করুণা, মমতা শূন্য, অহকার শূন্য, সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, ক্ষমাশীল, সর্বদা তুষ্ট, দৃঢ়বিশ্বাসী, মনবুদ্ধি যার আমাতে অর্পিত, সেই যোগী আমার ভক্ত ও প্রিয়।"(১৩-১৪) "আকাঙ্ক্ষা হীন, শুচি শুদ্ধ যিনি , যিনি কর্মদক্ষ , উদাসীন, দুঃখহীন ও যিনি কোনও কারণেই ব্যস্ত নহেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।"(১৬)[xi] এটা স্পষ্ট যে কামনাহীন, ফলত্যাগী, সর্বাবস্থায় অবিচলিত, আসক্তিহীন, স্থিরচিত্ত ভক্তের 'ভক্তি' এখানে ব্রহ্মবাদীর ঈশ্বর অভিমুখী মন মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার 'ভক্তি'র সঙ্গে আমরা ভাষ্যকার রামানুজের 'ভক্তি' ধারণার মিল পাই। তাঁর পূর্বে কেবলাদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার শঙ্কর 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'–বলে 'ব্রহ্ম'-কে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে "ব্যবহারিক স্তরে ঈশ্বর জীবের উপাস্য দেবতা। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে, জীব ও ব্রহ্ম এক। উপাস্য ও উপাসক ভেদ না থাকিলে উপাসনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং, পরব্রহ্ম উপাস্য নহেন, জ্ঞেয়। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।"[xii] শঙ্করের পরবর্তীকালের বৈষ্ণব বৈদান্তিক রামানুজ(১০১৬-১১৩৭) দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ। শঙ্করের মতের বিরুদ্ধে রামানুজের যুক্তি, "ব্রহ্ম সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব বা সত্য, কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নহেন, কারণ জীব এবং জগৎও ব্রহ্মের ন্যায় সত্য।...প্রকারভেদে সত্ত্বা তিনটি—ব্রহ্মসত্ত্বা, জীবসত্ত্বা, ও জগৎসত্ত্বা।"[xiii] রামানুজের মতে নিষ্কাম কর্মই মুক্তি লাভের প্রথম পদক্ষেপ। "তাহার পরে মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সদ্ গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাই, ভক্তিও আবশ্যক। রামানুজের মতে 'ভক্তি' শব্দের অর্থ ধ্যান বা উপাসনা। ধ্যানকে তিনি "তৈল–ধারাবদ্ অবিচ্ছিন্না স্মৃতি-সন্তানরূপা ধ্রুবা স্মিতিঃ" বলিয়া বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাবলীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া মুমুক্ষু অনবরত ধ্যানে রত হন। কিন্তু কেবল ধ্যানেও মুক্তি নাই, ব্রহ্মের প্রসাদ না হইলে সকলই ব্যর্থ হয়।"[xiv] স্বয়ং ব্রহ্মের কৃপাতেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব। এই ব্রহ্মসাক্ষাতেই মুক্তি। 'ব্রহ্ম'কে রামানুজ 'বিষ্ণু' নামে চিহ্নিত করেছেন। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণকারীর গুণাবলি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত ভক্তের গুণাবলীর প্রায় কাছাকাছি। 'প্রপত্তি'মার্গে ভক্ত ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করে। সর্বজন প্রীতি, অহিংসা, ত্রাণকর্তা রূপে ভগবানে বিশ্বাস, ঈশ্বরের কৃপা ও আশ্রয় প্রার্থনা, অহং ভাব বর্জন, ও শেষে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ- প্রপত্তির এই ছয়টি অঙ্গ। যা লক্ষণীয় তা হল "ভক্তি বা উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক বলিয়া উচ্চবর্ণত্রয়ের এবং জ্ঞানী, গুণী ও মেধাবী সাধকগণেরই উপযুক্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, নির্বিশেষে সকলেই প্রপত্তির অধিকারী।"[xv] বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুক্তি লাভের ইচ্ছাকে প্রপত্তি-ই স্বীকৃতি দেয়।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে অন্ধ্রের তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক তাঁর 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'-এ 'ব্রহ্ম'কে 'কৃষ্ণ' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে 'জীবজগত স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ উভয়তই ভিন্নাভিন্ন।' মোক্ষ বা মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যান, প্রপত্তি , গুরুপসত্তি – এই চার রকম সাধন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। "রামানুজের মতে 'ভক্তি' শব্দের অর্থ ধ্যান বা উপাসনা। কিন্তু নিম্বার্কের মতে ভক্তি ও ধ্যান অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হইলেও ভিন্নার্থক। ভক্তি উপাসনা নহে, প্রগাঢ় ভগবৎ প্রীতি। নিম্বার্ক

ইহাকে "প্রেমবিশেষ- লক্ষণা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তি ও ধ্যান জ্ঞানমূলক । ব্রহ্মের নিরতিশয় ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে স্বতঃই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, শ্রদ্ধা হইতেই প্রীতির উদ্ভব, এবং এরূপ প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি দুই প্রকার – পরা ও অপরা। উল্লিখিত জ্ঞানমূলক ভক্তি পরা ভক্তি। কিন্তু কর্মমূলক ভক্তির নাম অপরা ভক্তি। .... রামানুজ ও নিম্বার্কের মধ্যে প্রভেদ এই যে , রামানুজ উপাস্য-উপাসকের সম্মন্ধকে শ্রদ্ধামূলক, এবং নিম্বার্ক প্রীতি মূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধা প্রীতির জনক, কিন্তু শুষ্ক শ্রদ্ধা উপাস্য ও উপাসকের ভিতর ব্যাবধানের সৃষ্টি করে, যেরূপ গুরুশিষ্য, রাজাপ্রজার সম্পর্ক। কিন্তু প্রীতি উপাস্য ও উপাসকের নিবিড়তম মিলনের সেতু, যথা স্বামীস্ত্রী, বন্ধুদ্বয়ের সম্পর্ক। রামানুজ শ্রদ্ধার দিক, এবং নিম্বার্ক প্রীতির দিকে জোর দিয়াছেন। সেজন্য, রামানুজের ভক্তি ঐশ্বর্যপ্রধানা(শ্রদ্ধাপ্রধানা); নিম্বার্কের ভক্তি মাধুর্য্য-প্রধানা (প্রেমপ্রধানা)।"[xvi] শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশবভারতী দ্বৈতবাদী 'মধ্ব'র অনুগামী ছিলেন। মধ্ব'র ভাষ্যেও 'ভক্তি' উল্লিখিত। শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। অতএব মেনে নিতেই হয় মধ্যযুগের ভক্তিবাদি আন্দোলনে ও শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শে নিম্বার্কের মাধুর্য্য-প্রধানা ভক্তির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

মধ্যযুগের ভারতে "উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের উপর নানা নিষেধ আরোপ করত। অব্রাহ্মণদের না ছিল পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠের স্বাধীনতা, না সমান ভাবে মন্দিরে যাওয়ার অধিকার। অন্য জাতি বা বর্ণের সঙ্গে খাওয়া বা বিয়ে করাও নিষিদ্ধ ছিল।"[xvii] ছোঁয়াছুঁয়ি, আচার-আচরণ, জাত-বিচারের গোঁড়ামিতে সাধারণ মানুষ জর্জরিত ছিল। "ঐ সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম মানুষের জীবনে অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ এই ধর্মমতগুলি অযথা রীতিনীতির উপর জর দিত বা চূড়ান্ত ভাবে অ-সাংসারিক জীবন যাপন করত। এতে না ছিল মানুষের আবেগের জায়গা, না ভাল থাকার চাবিকাঠি।

এরকম অবস্থায় সরল, সোজা তামিল ভাষায় নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জানায় অলভার এবং নায়নার সাধকরা। .... খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ–চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তুর্কিরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। তাঁদের কাছে হেরে যাওয়ায় রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা কমে আসে। তাঁর সঙ্গেই কমে যায় তখনকার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের দাপট। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে

নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন।....তবে এই সাধকদের ভক্তি চিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এঁদের সবার ভক্তি দর্শনের মূল ক্তহা ছিল দুটি। একটি হল কোন ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হল সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মত করে পাওয়া।"[xviii] শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে ভক্তিবাদকে বাংলায় প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। "তাঁদের মতে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন সেই ব্রহ্ম যিনি জগতের প্রভু স্বরূপ এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে যার প্রেম ও স্নেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।....ঈশ্বর, জীবসমূহ ও জড় জগতের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।"[xix] এই মতবাদ নিম্বার্কের মতের কাছাকাছি। মনে রাখতে হবে, বাংলায় তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই বৈষ্ণবরা ছিলেন। ছিলেন বলেই আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পেয়েছি। পেয়েছি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসের পদাবলীকে। শ্রীচৈতন্যের জন্মের অনেক আগে "বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হোসেনশাহি রাজত্বে শাসন কাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে কায়স্থদের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তার পাশাপাশি শাসক-আমলাদের অত্যাচারও ছিল। এইসব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উত্তর প্রচলিত হিন্দু ধর্মে খুঁজে পায়নি সাধারণ গরীব মানুষ। ফলে অনেকেই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তুলনায় উদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এর পাশাপাশি, আগে থেকেই নানান ধর্ম ও বিশ্বাস সমাজে চালু ছিল। আকর্ষণ ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিও। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম – এই তিন লৌকিক দেবদেবীর পুজোর চল ছিল। .... শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীরা মাত্র একটি সামাজিক নীতি মেনে চলায় জোর দিয়েছিলেন। সেই নীতিকেই ভক্তি বলা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর জন্য কোনো উদ্যোগ আয়োজন লাগে না। সাধারণ জীবন যাপন ও সহজ সরল আচরণেই গুরুত্ব দিতেন শ্রীচৈতন্য।"[xx] আমরা এবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব শ্রীচৈতন্য পূর্ব ও পরবর্তীকালের ভক্তিবাদকে।

"বৈষ্ণবেরা উপনিষদের রস-ব্রহ্ম বা আনন্দ- ব্রহ্মের উপাসক। আনন্দ হইতেই এই সমুদয় ভূতের জন্ম হইয়াছে, আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, তাহারা আনন্দকে জানিতেছে এবং অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে- এই শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান। ভগবান পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হইয়াও নরলীলা-রূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।"[xxi] বৈষ্ণব মতে "শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ নরাকার ভগবান্। সৎ-এর শক্তি 'সন্ধিনী', চিৎ-এর 'সম্বিত' এবং আনন্দের

'হ্লাদিনী'। ললিতা- বিশাখা- চন্দ্রাবলী- রাধা সকলেই হ্লাদিনীর মানবী রূপ। হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুর্ণতম প্রকাশ রাধিকা। সংক্ষেপে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কত্তৃক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায়ে আস্বাদন"[xxii] শ্রীকৃষ্ণ "অচিন্ত্য মাধুর্যের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৈষ্ণবের ভগবান মানুষের প্রীতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল।"[xxiii] ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে রচিত শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থই বিধিবদ্ধ ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তি রহস্যকে উন্মোচিত করে সাধারণের কাছে। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশেই শ্রীরূপ এই কাজ করেন। ২১৪১ টি শ্লোক সন্নিবিষ্ট এই গ্রন্থের চারটি বিভাগ-"পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। বিভাগগুলি আবার লহরীতে বিভক্ত।.... পূর্ব বিভাগের চারটি লহরী, সামান্য ভক্তি, সাধন ভক্তি(বৈধী ও রাগানুগা), ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি (ভক্তির পরিণত অবস্থা)।"[xxiv] ভক্তি ও ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য বিস্তর। "সাধারণতঃ ভক্তির নয়টি লক্ষণ বলা হয়- শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।। ...এই শ্রবণ কীর্তন যদি শাস্ত্রের শাসন ভয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা বৈধী ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে।"[xxv] ভয়ে ভয়ে ভগবানকে ডাকা, স্মরণ করা, অর্চনা করা ও তাঁর নাম কীর্তন করাই বৈধী ভক্তি। বিপরীতে মধুর আস্বাদনের কারণে , স্নিদ্ধতা অনুভবের কারণে, রসযুক্ত শ্রবণের কারণে কেউ যদি ভগবানের নাম কীর্তন করে তবে তা রাগানুগা ভক্তি। "এই রসযুক্ত শ্রবণ ও কীর্তনকে আর বিধিমার্গের মধ্যে গণনা করা যায় না। ইহা তখন সেই রসময়ের রসিক ভাবুকের সহিত রসের খেলায় পরিণত হয়। এখানে ভ্য ভালবাসায় পর্যবসিত হয়। .... তিনি এত অন্তরঙ্গ, এত কোমল, এত করুণ, এত সুহৃৎ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন যে, ভক্তগণ তাঁহাকে কেহ প্রভু, কেহ সখা, কেহ সন্তান, কেহ কান্ত ভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাঁহার লীলামাধুর্যের আস্বাদন করিতে করিতে সর্বক্ষণ তাঁহাতেই নিমগ্ন থাকেন।"[xxvi] শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে আবিষ্ট হয়ে ধাপে ধাপে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তের যাত্রা। উল্লিখিত প্রথম চারটি স্তর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-র পশ্চিম বিভাগের প্রথম থেকে পঞ্চম লহরীতে আলোচিত। শ্রীরূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-তে মধুর রস বিশদে আলোচিত হয়েছে। "পদাবলীর কৃষ্ণ মাধুর্য রসময়। তাঁহার ঐশ্বর্য-ভাবকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান হইয়াও পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে আমাদের আপন করিয়া দিয়াছে।"[xxvii] স্বয়ং "শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী ;....

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধারণের ভজনা প্রকৃত পক্ষে গোপীভাবের; রাধাভাবের নহে,..।"[xxviii] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের চোখে শ্রীচৈতন্যদেব একই দেহে রাধা এবং কৃষ্ণ।

একটি আশ্চর্য সমাপতন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভাষ্যকার বল্লভ ১৪৭৯ খ্রীঃ তেলেগুভাষী কনকরব-এ জন্ম গ্রহণ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক হিসেবে তিনি পরিচিত। মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবে জ্ঞান ও তিনি 'ভক্তি'কে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে ভক্তি দুই রকম। মর্যাদাভক্তি এবং পুষ্টিভক্তি। পুষ্টিভক্তির চারটি ভেদের শেষটি হল শুদ্ধপুষ্টিভক্তি। এই ভক্তির অপর নাম প্রেম ভক্তি। "পুষ্টিভক্তগণ সালোক্য মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা হরির সহিত সমলোকস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত গোপ, গোপী, ইত্যাদি ভাবে রাসক্রীড়ায় লিপ্ত হন, এবং নিরবচ্ছিন্ন, অনন্ত আনন্দলাভে ধন্য হন।"[xxix] বল্লভের ভক্তিও মুলতঃ মাধুর্য ও রাগ মূলক।

তথ্যসূত্র

[i] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেনারেল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.৪৫

[ii] রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা আচার্য, শ্রী বেদমাতা গায়ত্রী ট্রাস্ট,২০১৩, হরিদ্বার, পৃ.১২

[iii] ভারতদর্শনসার, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ.২৬৩

[iv] শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিপদ কাব্যতীর্থ সংকলিত, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ.১৪৮

[v] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেনারেল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.১৭৫

[vi] ঐ, পৃ.১৭৪

[vii] সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ২০১১, কলকাতা, পৃ.৯৭৪

[viii] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেনারেল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.১৭৪

[ix] ঐ, পৃ.১৭৫

[x] শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিপদ কাব্যতীর্থ সংকলিত, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ.১৪৮

[xi] ঐ, পৃ.১৫০

[xii] বেদান্ত-দর্শন, রমা চৌধুরী, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ.১৮

[xiii] ঐ, পৃ.২১-২২

[xiv] ঐ, পৃ.৩৮

[xv] ঐ, পৃ.৩৯

[xvi] ঐ, পৃ.৪৫-৪৬

[xvii] অতীত ও ঐতিহ্য (সপ্তম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.১১৭

[xviii] ঐ, পৃ.১১৮

[xix] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেনারেল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.১৯১

[xx] অতীত ও ঐতিহ্য (সপ্তম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ.১২৩

[xxi] পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, বিমানবিহারী মজুমদার, জিজ্ঞাসা,১৩৯৮, পৃ.৩

[xxii] বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, ভূমিকা: শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ২০১১,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.১৭

[xxiii] পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, বিমানবিহারী মজুমদার, জিজ্ঞাসা,১৩৯৮, পৃ.৩

[xxiv] শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, ১৯৯৭, কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৬৭

[xxv] ভারতের অধ্যাত্মবাদ, নলিনিকান্ত ব্রহ্ম, বিশ্বভারতী, ১৪১৩, কলকাতা, পৃ.৩৩

[xxvi] ঐ, পৃ.৩৩

[xxvii] পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, বিমানবিহারী মজুমদার, জিজ্ঞাসা,১৩৯৮, পৃ.৫

[xxviii] বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদিত, ভূমিকা: শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ২০১১,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.১৯

[xxix] বেদান্ত-দর্শন, রমা চৌধুরী, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ.৫৭